তেসরা নভেম্বর: ইতিহাসে আরেকটি বর্বর হত্যাকান্ড।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

বাংলাদেশের ইতিহাসে বেশকিছু অবিস্মরণীয় ঘটনা আছে। ইতিহাসে ঘটনার অনিবার্য সঞ্চয় হয়ে আছে- ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বাঙালির স্বাধীনতা অর্জন, মুক্তিযুদ্ধের শেষপ্রান্তে বুদ্ধিজীবী হত্যা, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবার হত্যা, একই সালের ৩রা নভেম্বর জেলখানার অভ্যন্তরে জাতীয় চার নেতা হত্যা। এমনকি ২০০৪ সালের ২১ শে আগস্ট গ্রেনেড হামলার ঘটনা-একই সূত্রে গাঁথা।

আমাদের দেশের কারাগারের স্লোগান হচ্ছে- 'রাখিবো নিরাপদ, দেখাবো আলোর পথ'। এই স্লোগানের সঙ্গে তেসরা নভেম্বরের হত্যাকান্ড তথা জেল হত্যাকান্ডের ঘটনা সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। কয়েদিদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল হচ্ছে জেলখানা। আর সেই আশ্রয়স্থলে যদি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান ব্যক্তির নির্দেশে কয়েদিদের গুলি করে ও বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়, তাহলে রাষ্ট্রের নিয়মনীতি ও মানবতা কোথায় দাঁড়ায়?

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর এ ধরনের একটি নৃশংস হত্যাকান্ড সংগঠিত হয়েছিল। হত্যা করা হয় জাতীয় চার নেতা- মুক্তিযুদ্ধকালীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ওই সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, কৃষিমন্ত্রী এএইচএম কামারুজ্জামানকে। এই জাতীয় চার নেতা কোনো সাজা প্রাপ্ত কয়েদি ছিলেন না, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ লালন করতেন বলে তাঁদের ঠাঁই হয় জেলখানায়।

বঙ্গবন্ধুর প্রায় সমবয়সী এই চার জাতীয় নেতা ১৯৫০ এর দশক থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত আমৃত্যু বঙ্গবন্ধুর আনুগত্য ও নির্দেশ মেনে চলেছেন। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁরা বিশ্বস্ততা ও যোগ্যতার সাথে মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং দেশ শত্রুমুক্ত করেছেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগস্টের নির্মম হত্যাকান্ডের পর বঙ্গবন্ধু শূন্য এই দেশে খুনি মোশতাকের প্রস্তাব মেনে নিলে তাঁরা মন্ত্রিত্ব বা আরও অন্য কোনো সুযোগ সুবিধা পেতেন, কিন্তু জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও তাঁরা খুনিদের প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ করেছেন। ফলে তাঁদেরকেও জীবন দিতে হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর প্রতি এই বিশ্বস্ততার কারণে আজ তাঁরা ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। শুধু ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর জেলখানায় বন্দি অবস্থায় মোশতাকের ঘাতক বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে খুন হয়েছিলেন বলেই তাঁরা জাতীয় নেতার মর্যাদা লাভ করেননি। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ভূমিকার জন্য তাঁরা জাতীয় নেতার মর্যাদা লাভ করেছেন।

১৯৭৫ সালের পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যার তিন মাসের মধ্যেই ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্তে আরও একবার রক্তে রঞ্জিত হয় বাংলাদেশ। ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে ৩রা নভেম্বর ছিল মূলত ১৫ই আগস্টের অসমাপ্ত হত্যাকান্ড। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে যাঁরা লাল সবুজের পতাকা বহন করতে পারে, তাঁদেরকেও নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। ষড়যন্ত্রকারীরা সাময়িকভাবে সফলও হয়েছিল।

১৯৭৫ সালের নভেম্বরে ঢাকা শহর ছিল অস্থিরতার নগরী। ঐ সময় সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থান নিয়ে নানারকম কথা বাতাসে ভাসছিল। ৩রা নভেম্বর রাত আনুমানিক দেড়টা থেকে দুইটার দিকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে একটি পিকআপ এসে থামে। সেসময় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জেলার হিসেবে কর্মরত ছিলেন আমিনুর রহমান। রাত দেড়টার দিকে কারা মহাপরিদর্শক টেলিফোন করে জেলার আমিনুর রহমানকে তাৎক্ষণিকভাবে আসতে বলেন। দ্রুত কারাগারের মূল ফটকে গিয়ে আমিনুর রহমান দেখলেন, একটি পিকআপে এ কয়েকজন সেনা সদস্য সশস্ত্র অবস্থায় আছে। এর কিছুক্ষণ পর তার কার্যালয়ের টেলিফোনটি বেজে ওঠে। আমিনুর রহমান যখন টেলিফোনের রিসিভারটি তুললেন, তখন অপর প্রান্ত থেকে বলা হল প্রেসিডেন্ট কথা বলবেন।

২০১০ সালে বিবিসি বাংলার কাছে সে ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে আমিনুর রহমান বলেন, 'টেলিফোনে বলা হলো প্রেসিডেন্ট কথা বলবে আইজি সাহেবের সাথে। তখন আমি দৌড়ে গিয়ে আইজি সাহেবকে খবর দিলাম। কথা শেষে আইজি সাহেব বললেন যে প্রেসিডেন্ট সাহেব ফোনে বলছে আর্মি অফিসাররা যা চায়, সেটা তোমরা করো'।

রাত প্রায় তিনটা পর্যন্ত কারাগারের মূল ফটকের সামনে কথাবার্তা চলতে থাকে। একপর্যায়ে কারাগারে থাকা তৎকালীন আওয়ামী লীগের চার নেতাকে একত্রিত করার নির্দেশ আসে। এরপর কারা মহাপরিদর্শক জেলার আমিনুর রহমানের হাতে চারজনের নাম লেখা একটি চিরকুট ধরিয়ে দিয়ে বলেন, এদেরকে এক জায়গায় করো। সেই চারজন হলেন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এইচএম কামারুজ্জামান। এই চার নেতাকে দ্রুত একত্রিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

জেল হত্যাকাণ্ডের সময় জাতীয় চার নেতার সাথে কারাগারে ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া। জেল হত্যাকান্ড সম্পর্কে মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরীর বর্ণনা অনুযায়ী, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের একটি বিল্ডিংয়ের এক নম্বর কক্ষে ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দিন আহমদসহ আট জন। দুই নম্বর কক্ষে ছিলেন এএইচএম কামারুজ্জামান, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়াসহ ৮/৯ জন। তিন নম্বর কক্ষে ছিলেন এম মনসুর আলী, আব্দুস সামাদ আজাদ, আমির হোসেন আমুসহ প্রায় ১২ জন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দিন আহমদকে তাদের কক্ষে রেখে বাকি কয়েদিদের কক্ষ থেকে বের করে দেওয়া হয়। অন্য দুটি কক্ষ থেকে এএইচএম কামারুজ্জামান এবং এম মনসুর আলীকে এক নম্বর কক্ষে নিয়ে আসা হয়। তারপর জাতীয় চার নেতাকে একসাথে ব্রাশ ফায়ার করা হয়। ব্রাশ ফায়ার করার পর ঘাতকরা চলে যায়। তিনজন নেতা তাৎক্ষণিকভাবে মৃত্যুবরণ করলেও একজন মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন। এ খবর পেয়ে ঘাতকরা জেল গেট থেকে এসে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জাতীয় চার নেতার মৃত্যু নিশ্চিত করে। এভাবে নৃশংসভাবে জাতীয় চার বীর সন্তানকে হত্যা করা হয়।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর আওয়ামী লীগের মধ্যে নেতৃত্ব সংকট সৃষ্টি হয়। বঙ্গবন্ধুর পর এই চার জাতীয় নেতা ছিলেন দলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ১৫ই আগস্টের পর চার জাতীয় নেতাসহ জ্যেষ্ঠ অনেক নেতা ছিলেন কারাগারে এবং কেউ কেউ ছিলেন আত্মগোপনে। বাকি আওয়ামী লীগ নেতারা প্রকাশ্যে কিংবা অপ্রকাশ্যে খন্দকার মোস্তাক আহমদের সাথে সমঝোতা করেন। অনেক নেতা আবার রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয় হয়ে যান।

জেল হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ হলো বঙ্গবন্ধুর আদর্শের নেতৃত্বকে নিশ্চিহ্ন করা। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা করে ক্ষমতা দখল করার পরেও ঘাতকরা নিজেদের নিরাপদ ভাবতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকেই হত্যাকারী সেনা কর্মকর্তারা পাল্টা আরেকটি অভ্যুত্থানের আশঙ্কায় ছিলেন। সেসময় সেনাবাহিনীর মধ্যে ছিল এক ধরনের বিশৃঙ্খলা। জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিল ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। বঙ্গবন্ধু হত্যাকারী সেনা কর্মকর্তারা ধারণা করেছিলেন যে, কোনো পাল্টা অভ্যুত্থান হলে সেটি আওয়ামী লীগের সমর্থন পাবে এবং জেলে থাকা চার জাতীয় নেতা নেতৃত্বে চলে আসবে। আরো বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই চার নেতা জীবিত থাকলে তারা কোনদিন রেহাই পাবে না। জাতীয় চার নেতা বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার ও তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নে অটুট থাকবেন। এরকম আশঙ্কা থেকে জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। জেল হত্যাকান্ডের সাথে ৩রা নভেম্বর মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ এর নেতৃত্বে পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কিত। জেল হত্যা মামলার পলাতক আসামিদের দন্ড কার্যকরের অপেক্ষায় রয়েছে গোটা জাতি।

দলমত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিজয়ের লাল সূর্য ছিনিয়ে আনতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এই চার জাতীয় নেতা। বাংলাদেশ সৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠ সহচর জাতীয় চার নেতার অবদান চিরস্মরণীয়। জাতীয় চার নেতা মন্ত্রিসভায় যোগ না দিয়ে জেলে গিয়েছিলেন। ক'জন বাঙালি এরকম দূরদর্শী সিদ্ধান্ত নিতে পারবে? তারা নির্মোহ ছিলেন বিধায় এমন কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন। তারা জীবনের চেয়েও দেশকে বেশি ভালোবাসতেন। এরা বাঙালি জাতির ইতিহাসে উজ্জ্বল নক্ষত্র। এরকম হত্যাকান্ড জাতি আর দেখতে চায় না। বাংলাদেশ যতদিন থাকবে জাতি ততদিন বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে।

লেখক: সহকারী তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস (পিআইডি), ময়মনসিংহ।